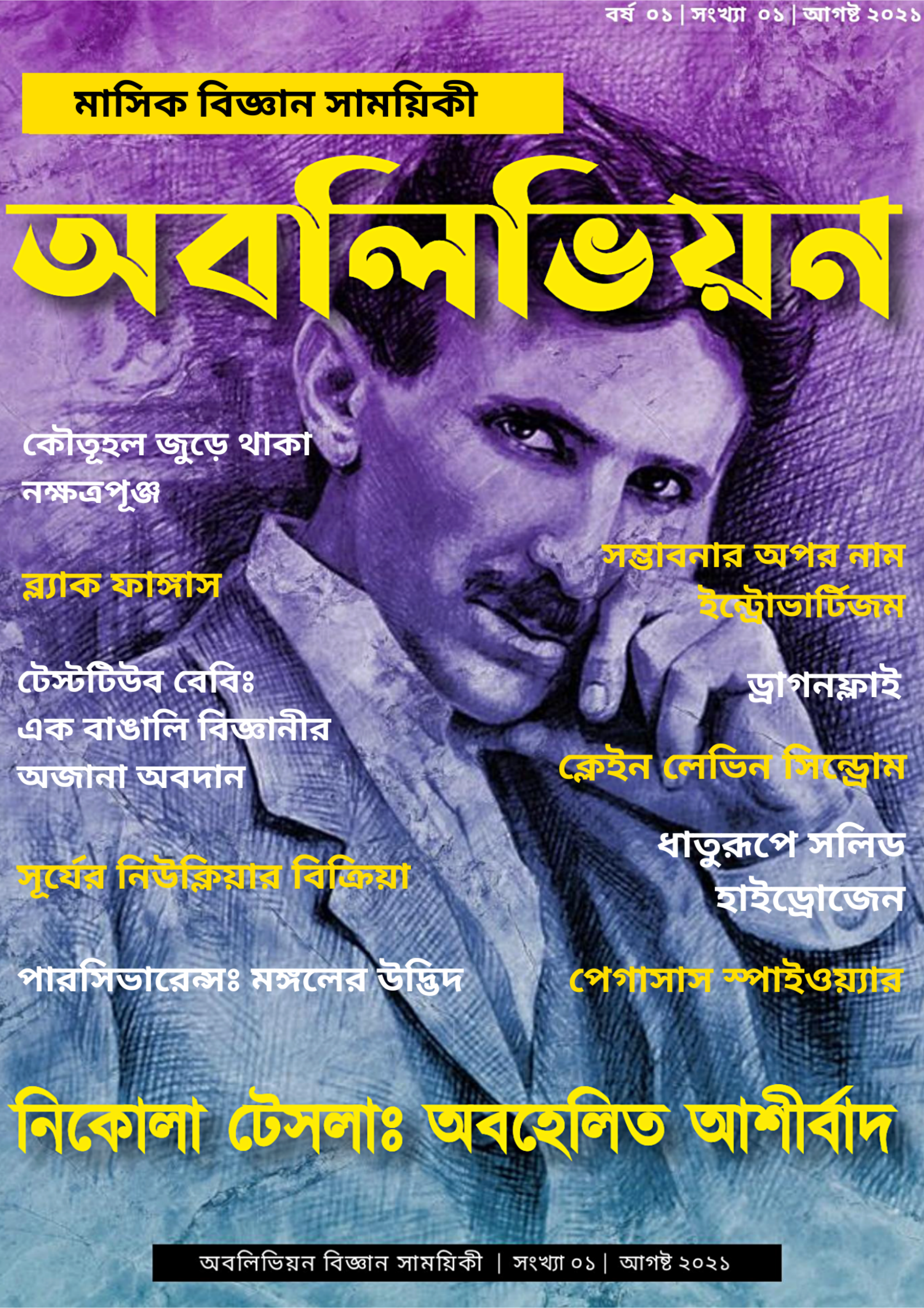
বর্ষ ০১ | সংখ্যা ০১ | আগষ্ট ২০২১



মাসিক বিজ্ঞান সাময়িকী

অবলিভিয়ন

কৌতূহল জুড়ে থাকা নক্ষত্রপূঞ্জ

ব্ল্যাক ফাঙ্গাস

টেস্টটিউব বেবিঃ এক বাঙালি বিজ্ঞানীর অজানা অবদান

সূর্যের নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া

পারসিভারেন্সঃ মঙ্গলের উদ্ভিদ

সম্ভাবনার অপর নাম ইন্ট্রোভার্টিজম

ড্রাগনফ্লাই

ক্লেইন লেভিন সিন্ড্রোম

ধাতুরূপে সলিড হাইড্রোজেন

পেগাসাস স্পাইওয়্যার

নিকোলা টেসলাঃ অবহেলিত আশীর্বাদ

সম্পাদকীয়

কার্বন ন্যানোটিউব দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে বিদ্যুৎ উৎপাদন সেক্টরে নতুন অধ্যায় সূচনা করতে পেরেছেন এসময়ের বিজ্ঞানিরা।ধারণা করা হয় বিজ্ঞানী নিকোলাস টেসলা তার সময়কালে তারবিহীন বিদ্যুৎ সরবরাহ করার প্রযুক্তি আবিষ্কার করেছিলেন কিন্তু স্বার্থান্বেষী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গুলোর জন্য সেটি আলোর মুখ দেখতে পারেনি।অন্যদিকে সম্প্রতি ইসরায়েলি একটি সংগঠন এনএসও গ্রুপের স্পাইওয়্যার সরঞ্জাম পুরো ইন্টারনেট দুনিয়ায় আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এদিকে গত মে মাসের আগে করোনা সংক্রমণ কমে আশায় আশার আলো দেখতে পেয়েছিলো সকলে।কিন্তু মে মাসে ভারতীয় ভ্যারিয়েন্ট সনাক্ত হওয়ার পর থেকে নতুন করে মাত্রাতিরিক্ত সংক্রমণ দেখা যাচ্ছে।ভারতীয় ভ্যারিয়েন্ট থেকে ব্লাক ফাঙ্গাস সংক্রমণ হওয়ায় মেডিকেল সেক্টরকে নতুন করে সবকিছু সামাল দিতে হচ্ছে।ক্যান্সার আক্রান্ত ব্যাক্তি অথবা পূর্ব থেকেই বিভিন্ন রোগে ভোগা ব্যাক্তিদের এর সংক্রমণ এ অঙ্গহানি হচ্ছে, এমনকি তাদের মৃত্যুর সম্ভাবনাও প্রকট।
রাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে আলোর ঝলকানি ছড়ানো তারকারাজির দল কারোর চোখ জুড়ায় আবার কারোর কৌতূহল জুড়ে তাকে কাছে টেনে নতুন কিছু আবিষ্কার করার উন্মাদনা যোগায়।ইন্ট্রোভার্টরা তাদের কৌতূহল উদ্দীপনা দিয়ে সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিচ্ছে।সূর্য শূন্যের মধ্যে অবস্থান করে।অথচ নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া ঘটিয়ে হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম বানিয়ে পুরো সৌরজগতের শক্তির চাহিদা মেটাচ্ছে। অন্যদিকে হাইড্রোজেন গ্যাসকে ধাতুতে রূপ দিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা।এই সবকিছু নিয়ে আমাদের এবারের সংখ্যার আয়োজন।
পরিশেষে, ঘরে থাকুন সুস্থ থাকুন।করোনা থেকে দুরে থাকতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন।আমরা সকলে মিলে সাবধানতা অবলম্বন করতে পারলে খুব শীঘ্রই এই অন্ধকার ঘুচে আবারও নতুন করে আলোকময় পৃথিবীতে আমরা বিচরণ করবো সেই দিনেরই প্রত্যাশী।

সূচিপত্র

টপিক	পৃষ্ঠা

নিকোলা টেসলাঃ অবহেলিত আশীর্বাদ

লেখাঃ রুমিজ হাসান রক্তিম
Rangpur Govt. College, Rangpur



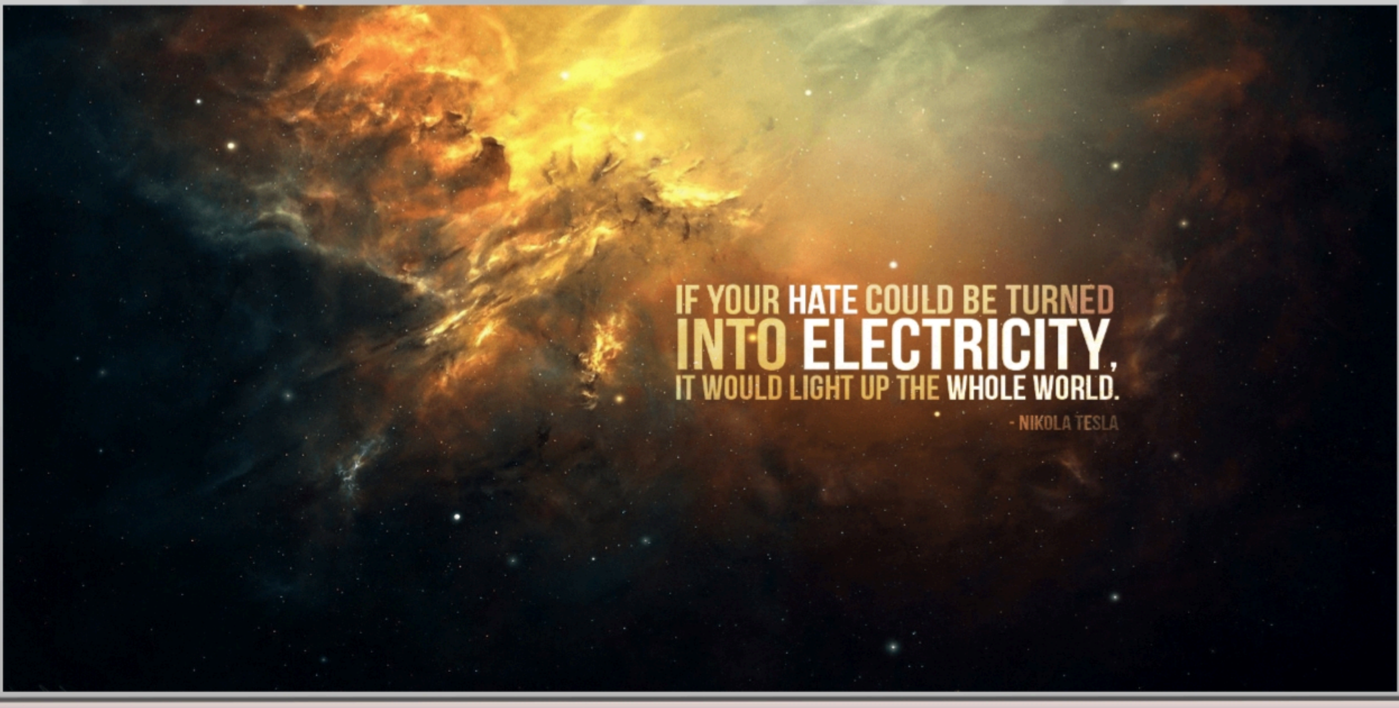
হারিয়ে যাওয়া এক বিজ্ঞানি নিকোলা টেসলা! যাকে শুধু আজকালের বাচ্চারা টেসলা কয়েল এবং পদার্থবিজ্ঞান ২য় পত্র বইয়ের সূত্রের মাধ্যমেই চেনে।

তাঁর জন্ম উনবিংশ শতাব্দীতে হলেও, টেসলাকে একবিংশ শতাব্দীর খুবই প্রয়োজন। কিন্তু ব্যাপার টা অনেকটা এরকম, বিজ্ঞানের আজ তাঁকে খুবই প্রয়োজন, কিন্তু বরণ করে নিতে মোটেই আগ্রহী নয়। আজকের দিনের যত নিত্য প্রয়োজনীয় আবিষ্কার, সবেতেই টেসলাকে খুজে পাওয়া যায়।
কিন্তু হায়! পৃথিবীর এক আজব নিয়ম, গরিব ও দুর্বলরা সবসময়ই নির্যাতিত। তাদের যত আবিষ্কার, যত কৃতিত্ব, সব চুরি করে নেয় সব কোট টাই পড়া সাহেব বাবুরা। যদি সত্য সবসময় দাপটের সাথে পৃথিবীতে বিরাজ করতো, আমরা হয়তো এরকম হাজারো টেসলাকে পেতাম। সাথে সেসব মিথ্যে মুখোশধারীদের হিরো ভাবা থেকেও নিস্তার পেতাম।

সালটা ১৮৫৬ । অস্ট্রিয়ার এক গ্রামে, কঠিন বজ্রবৃষ্টির রাতে টেসলার জন্ম। ধাত্রী বলেছিল, এ সন্তান অশুভ। অনেকটা অন্ধবিশ্বাসের মত ধারনা। কিন্তু তার মা বলেছিলেন, "টেসলা হবে আলোর সন্তান, **son of light**." তার আবিষ্কারের সাথে মিল রেখে **son of thunder** বলাও হয়তো ততটা ভুল হবে না।
যাই হোক, তার পিতা ছিলেন যাজক ও মা গৃহিনী।

তিনি উচ্চবিদ্যালয়ের ৪ বছরের কোর্স মাত্র ৩ বছরে শেষ করেন। ক্যালকুলাসের উপর অসাধারন দক্ষতা শিক্ষকদের মনে সন্দেহ ও বিষ্ময় উভয়ই তৈরি করেছিল।

সবকিছু ভালো মতই চলছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র হিসেবে পড়ালেখা নির্বিঘ্নে এগোচ্ছিল। ১ম বর্ষে কোনো ক্লাস ফাকি দেননি টেসলা। ফলাফল ৯ টি বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে ২য় বর্ষে উত্তীর্ণ।
টেসলার পিতার মৃত্যুর পর তার পিতার লেখা একটি চিঠি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধানের কাছে পৌছায়। যাতে লেখা ছিল,"যদি টেসলা অধিক পরিশ্রম করে, তাহলে সে মারা যাবে, এবং তাকে যেন বের করে দেয়া হয়"।
কারণ ১ম বর্ষে টেসলা ছুটির দিন বাদে ভোর ৩ টা থেকে রাত ১১ টা পর্যন্ত পড়ালেখা করতেন।



২য় বর্ষে শিক্ষক **Gramme Dynamo** র নজরেও এসেছিলেন টেসলা। কিন্তু সেই বছরই জুয়ায় আসক্ত হয়ে শিক্ষাবৃত্তি হারান। এখানেই অঘটনের শুরু।
শেষবর্ষে এসে পরীক্ষার জন্য কোনো প্রস্তুতিই তার ছিল না। পড়ালেখার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন তিনি।
শেষে পড়ালেখার পাঠ চুকিয়ে চলে যান বুদাপেস্টে চাকরি করতে। নির্মানাধীন একটি কোম্পানিতে ইলেক্ট্রিশিয়ান হিসাবে যোগদান করেন। তিনি চাকরি করা অবস্থায় সেই প্রতিষ্ঠানের যে পরিমাণ উন্নতি হয়েছিল, সেরকম আর কেউ করতে পারেনি।
পরবর্তীকালে তথাকথিত সেরা বিজ্ঞানি "টমাস আলভা এডিসন" এর কোম্পানিতে কাজ শুরু করেন টেসলা। ডিসি কারেন্টের আবিষ্কারক এডিসন বৈদ্যুতিক বাতি নিয়ে কাজ করছিলেন। কিন্তু তার ডিসি কারেন্ট দূর্বল হওয়ায় আলোর স্থায়িত্ব আর ক্ষমতা নিয়ে বেগ পেতে হচ্ছিল। টেসলা এডিসন কে বলেন যে, তিনি দ্রুত ও কমসময়ে **fluorescence** বাতির কাজ শেষ করতে পারবেন। এডিসন তাকে ৫০,০০০ ডলার অফার করেন এ কাজের বিনিময়ে। এছাড়াও বৈদ্যুতিক মোটরের ব্লুপ্রিন্ট ও বানিয়ে দেন টেসলা।

কাজ শেষ হবার পর বিশ্বাসঘাতকতা করেন মি.এডিসন। "আমেরিকানদের জোকস বুঝতে পারোনি টেসলা"!! এমনটাই অভিব্যাক্তি ছিল এডিসনের।



এমন পরিস্থিতিতে সব ছেড়েছুড়ে চলে আসেন টেসলা। যোগ দেন " ওয়েস্টিংহাউজ ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানিতে"।

এরপরই শুরু হয় বিশ্বখ্যাত বৈদ্যুতিক যুদ্ধ!!

একদিকে এডিসনের **DC** কারেন্ট বনাম ওয়েস্টিংহাউজের সাথে মিলে টেসলার **AC** কারেন্ট।

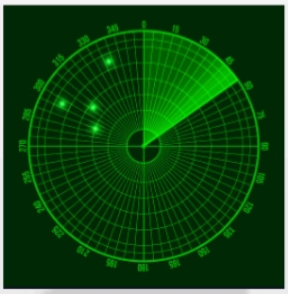
যাই হোক, শেষ পর্যন্ত টেসলার তত্ত্বই ঠিক হলো। তার চলবিদ্যুৎ এডিসনের স্থির বিদ্যুতের চেয়ে বেশী কার্যকরী প্রমাণিত হলো। চলবিদ্যুৎ আবিষ্কার না হলে আমাদের হয়তো আজকে এডিসনের প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হতো, যেখানে প্রতি ঘরে ঘরে জেনারেটর বসানো লাগতো। কিন্তু টেসলার প্রযুক্তি অনুযায়ী এখন বহু কিলোমিটার দূরে একটা পাওয়ার স্টেশনে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় এবং সেখান থেকে তার দিয়ে বাসা-বাড়িতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়।

কিন্তু টেসলা দুর্ধর্ষ বৈজ্ঞানিক হলেও যেহেতু তেমন মেধাবী ব্যবসায়ী ছিলেন না, তাই শেষ পর্যন্ত হারু পার্টির খাতায় নাম লেখালেন টেসলা-ই।

আরেকটি বহুল প্রচলিত ঘটনা,

টেসলার **AC** কারেন্টের উপযোগিতা উপলব্ধি করতে পেরে কূট বুদ্ধি সম্পন্ন এডিসন এক বিরাট সমাবেশ আয়োজন করেন। যেখানে **AC** কারেন্ট দিয়ে এক হাতিকে মেরে ফেলেন ঘাতক এডিসন!! এবং **DC** কারেন্ট দিয়ে কোনো ক্ষতি হয় না, সেটিও দেখিয়ে দেন। সরল মানুষকে এভাবেই ধোঁকায় ফেলে দেন মি.এডিসন।

আলোচনাকে তিক্ত না করে টেসলার কিছু আবিষ্কার দেখে নেয়া যাকঃ

*টেসলা কয়েল,
*ভ্যাকুয়াম টিউব,
*রোটারি ইঞ্জিন,
* লাউডস্পিকার,
*ওয়ারলেস যোগাযোগ ব্যবস্থা,
*রাডার প্রযুক্তি এবং আরো অনেক।



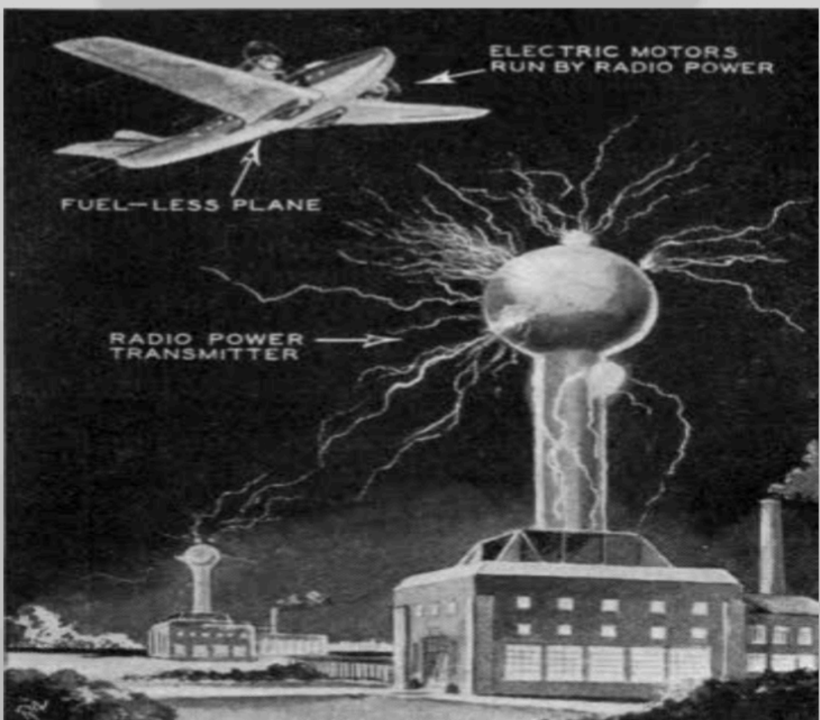
বলা হয় টেসলার অনেক পেটেন্ট চুরি করে নিজের নামে করে নেন অনেক বিখ্যাত মানুষ। যাদের মাঝে **এডিসন**, **মার্কনি** ও **ওয়েস্টিংহাউজ** এর নামও পাওয়া যায়।

টেসলা স্বপ্ন দেখতেন বিদ্যুৎ হবে সবার জন্য বিনামূল্যে। গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে তিনি এ ব্যাপারে আলোচনা করেন। সমাজের পুজিবাদি সেসব লোক টেসলাকে গুরুত্ব দেননি। টেসলা নিজেই এর বিকাশ ঘটান এবং সফলতার অনেক কাছেই চলে গিয়েছিলেন। এর মাঝেই তার মৃত্যু হয় বা ঘটানো হয়! তখন তৎকালীন এফবিআই চীফ 'জে. এডগার হুভার' আরও কিছু এফবিআই সদস্য নিয়ে টেসলার হোটেল রুমে হামলা চালিয়ে তার সুটকেস এবং সমস্ত কাগজ-পত্র লুটপাট করে। সেইসব কাগজ-পত্রের হদিস আজও পাওয়া যায়নি। এগুলো এই একবিংশ শতাব্দীতে এসেও পুজিবাদি আমেরিকা সরকার অত্যন্ত সুরক্ষিত ভল্টে জব্দ করে রেখেছে। ষড়যন্ত্র তত্ত্ববিদেরা বলেন টেসলার অনেক আইডিয়া মানব কল্যাণে না লাগিয়ে তারা গোপন বিধ্বংসী গবেষণায় কাজে লাগাচ্ছে।

টেসলার আবিষ্কার দেখে মানুষ তাকে উপহাস করত। তাঁর কথা বার্তায় হাসতো।

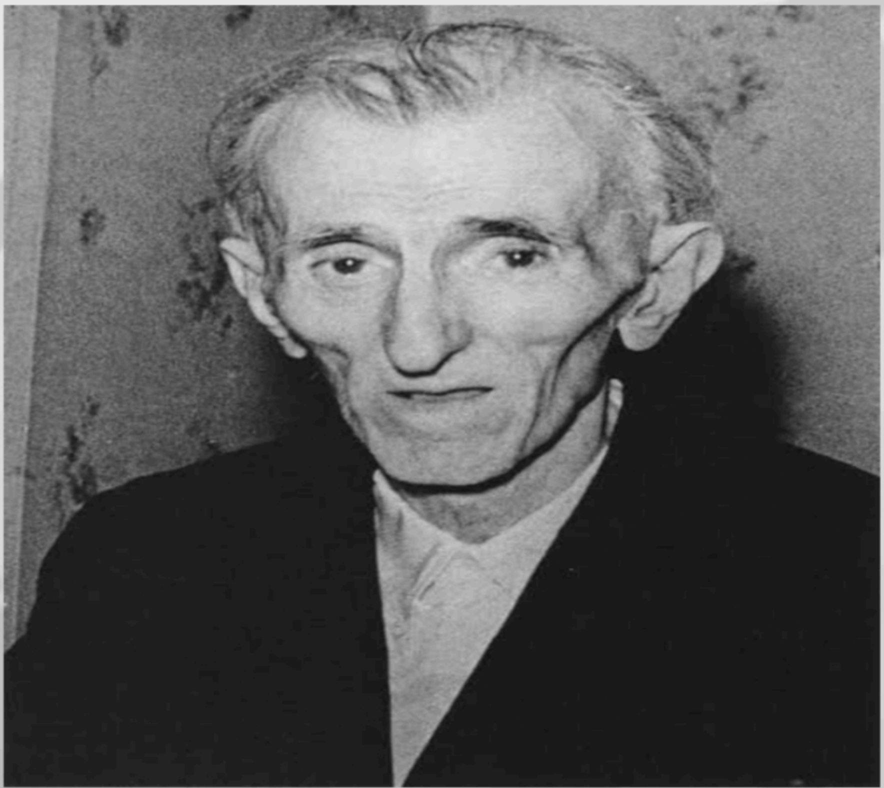
তিনি একবার বলেছিলেন, "এমন এক সময় আসবে যখন সংবাদ, গণ্যমান্যদের ভাষণ, কিংবা মাঠের খেলাগুলো তারবিহীন পদ্ধতিতে ঘরে বসেই দেখা যাবে"।
আজ আমরা এর বাস্তব রূপ দেখছি।

ক্ষুদ্র জীবনে মানবসভ্যতাকে অনেক কিছুই দিয়েছিলেন টেসলা। তাঁর মৃত্যুর আরো ৮০ বছর পরে বিজ্ঞানীরা জানান, টেসলার সেই তারহীন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রযুক্তি আবিষ্কারের দ্বারপ্রান্তে অনেকটাই আছেন তারা।
১০০ বছর আগে টেসলার যে ধারণাটাকে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলো সভ্যতা, এখন সেটাই আবার আবিষ্কার করতে নাকের জলে চোখের জলে একাকার একালের বিজ্ঞানীরা!!!





অনেক কিছুই পাবার কথা থাকলেও, প্রশংসা দূরে থাক, পেটের ভাতও জোগাতে পারতেন না টেসলা। এটি হলো অভাব। হয়তো এর কারনেই তিনি বেশি বেশি গবেষণা করতে পারেন নি। কে জানে টেলিভিশন, রেডিও, বিদ্যুৎ, এক্স রে, রাডার ইত্যাদির বাইরে আরো কত কিছু আমাদের উপহার দিতে পারতেন টেসলা!!!



১৯৪৩ সালে তোলা

আলো আবিষ্কার করা সেই মানুষটি অন্ধকারে বসে জীবনের শেষ দিন গুলো পার করেছেন। একাকি, একলা, নিঃস্ব এক মানুষ, যার আবিষ্কারে পেটে মেদ জমছে সমাজের পুজিবাদী শ্রেণীর মানুষদের!!

অবহেলিত এক আশীর্বাদ!

কৌতূহল জুড়ে থাকা নক্ষত্রপুঞ্জ

লেখাঃ মিশকাত নাফিসা
Jaldhaka Govt. College, Nilphamari

রাতের আকাশে খালি চোখে তাকালেই দেখা যায় শত সহস্র তারকা বা নক্ষত্র।

একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে নক্ষত্র গুলোর কোনোটা বেশি উজ্জ্বল আবার কোনোটা একটু ম্লান।

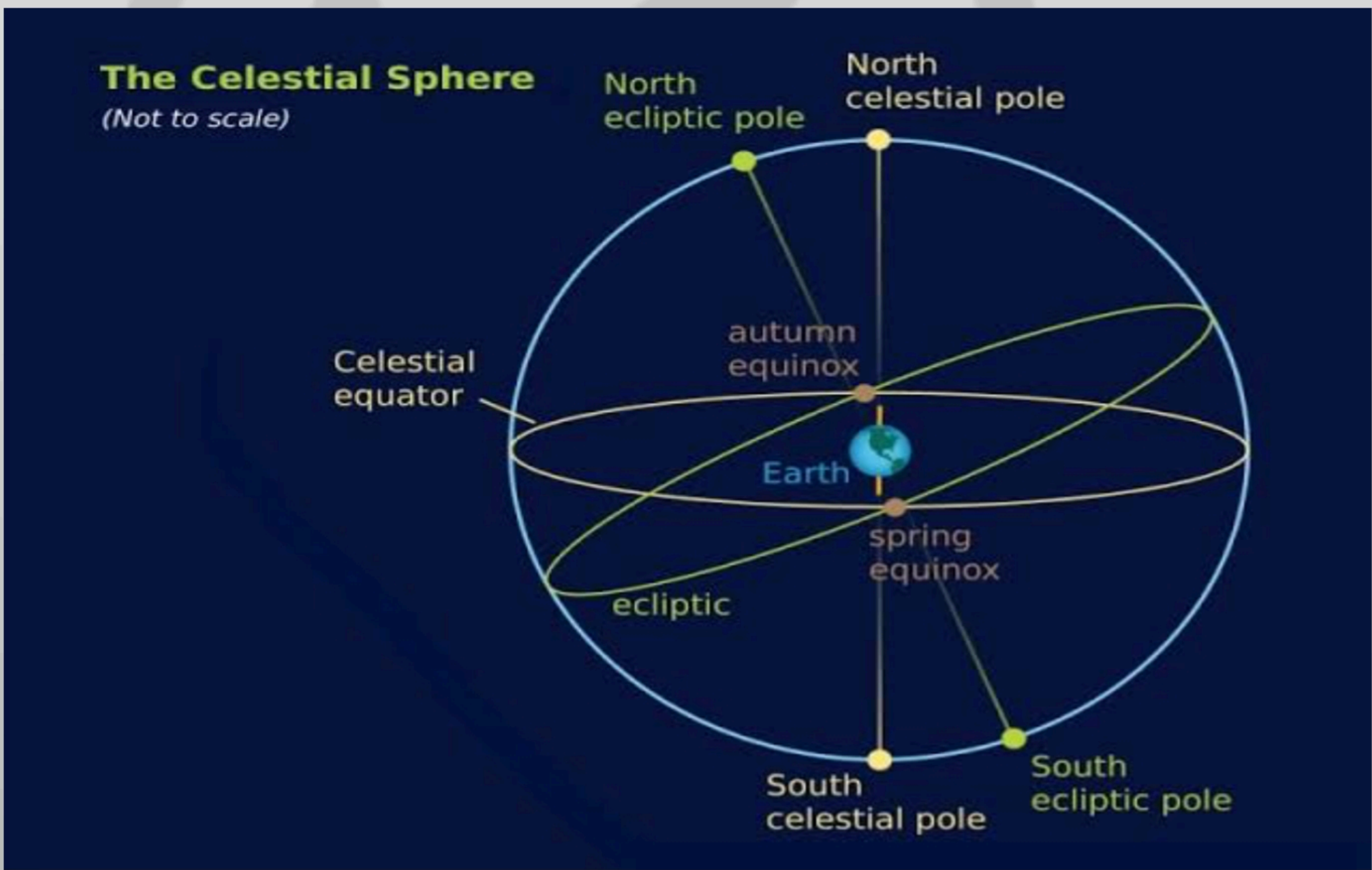
উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলো আকাশের গায়ে একটি নকশা তৈরি করে রাখে, যদি এক দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা যায় তবে সেই নকশা কারোই চোখ এড়াবে না।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন নক্ষত্রপুঞ্জ।



আমরা কি সব একই রকম নক্ষত্র দেখি?

যেহেতু পৃথিবী উত্তর দক্ষিণের কক্ষপথে ঘুরপাক খাচ্ছে, সে কারণে আমরা শুধু যে গোলার্ধে বাস করি, সে গোলার্ধ থেকে যে সকল নক্ষত্র দেখা সম্ভব সেগুলোই দেখতে পাই। পৃথিবীর মাঝ বরাবর গোলাকার একটি কালো বলের মতো রয়েছে যাকে বলা হয় আকস্মিক মণ্ডল (**Celestial sphere**)। উত্তর গোলার্ধের কাছাকাছি যারা বসবাস করে তারা সপ্তর্ষিমণ্ডল দেখতে পায়, কিন্তু দক্ষিণের কাছাকাছি এটা দৃশ্যমান নয়। দক্ষিণ গোলার্ধের কাছাকাছি যারা রয়েছে, তারা কখনোই সপ্তর্ষিমণ্ডল দেখতে পায় না। তবে বিষুবরেখার কাছাকাছি অঞ্চলে বসবাসকারীরা প্রায় সব ধরনের নক্ষত্র দেখতে পায়। তবে সব সময় না, বছরের কিছু কিছু সময়ে।



নক্ষত্রগুলো আকাশে স্থির থাকে না কেন?

রাতের আকাশে মনযোগের সঙ্গে তারকা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে, নক্ষত্রপুঞ্জ গুলো আকাশের পূর্ব থেকে পশ্চিমে যাচ্ছে। প্রাচীনকালে অবশ্য জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলতেন যে, নক্ষত্র গুলো আকস্মিক মণ্ডলের ভিতরে স্থির এবং এই মণ্ডলটি পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে।

কিন্তু আমরা জানি, সত্যটা ঠিক এর উল্টো। যেমন আমাদের পৃথিবী নামের গ্রহটি ঘুরছে, কিন্তু এর নক্ষত্র সূর্যটি নিশ্চল। পৃথিবীর এই ঘূর্ণন পূর্ব থেকে পশ্চিমে একটি সুনির্দিষ্ট অক্ষপথে। এজন্যই আমরা সময়ের ব্যবধানে নক্ষত্রপুঞ্জকে আকাশের এক অবস্থানে দেখে থাকি।



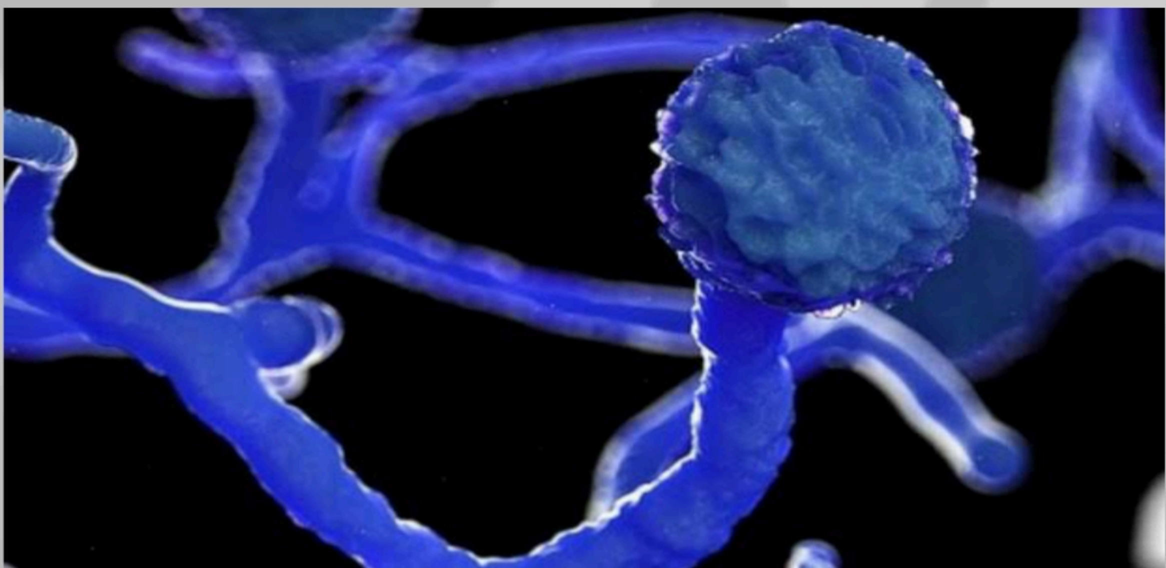
ব্ল্যাক ফাঙ্গাস

লেখাঃ শাহরিয়ার আল সাকিব
Rangpur Govt. College, Rangpur

ব্ল্যাক ফাঙ্গাস কী?

এটি একটি ছত্রাক-জনিত রোগ। মিউকোরমাইকোসিস খুবই বিরল একটা সংক্রমণ। মিউকোর নামে একটি ছত্রাকের সংস্পর্শে এলে এই সংক্রমণ হয়। সাধারণত এই ছত্রাক পাওয়া যায় মাটি, গাছপালা, সার এবং পচন ধরা ফল ও শাকসবজিতে।

চিকিৎসকরা বলছেন, এই ছত্রাক মাটি এবং বাতাসে এমনিতেই বিদ্যমান থাকে। এমনকি নাক ও সুস্থ মানুষের শ্লেষ্মার মধ্যেও এটা স্বাভাবিক সময়ে থাকতে পারে। এই ছত্রাক সাইনাস, মস্তিষ্ক এবং ফুসফুসকে আক্রান্ত করে। কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত ব্যক্তিদের ফুসফুস যেহেতু দুর্বল থাকে, সেজন্য তাদের ক্ষেত্রে ব্ল্যাক ফাঙ্গাস মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।



ব্ল্যাক ফাঙ্গাস



ভয়াবহ এই সংক্রমণ থেকে বাঁচতে খুব শীঘ্রই রোগ নির্ণয় করা উচিত। এটি মস্তিষ্কের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার আগেই রোগীদের নাক, চোখ বা এমনকি তাদের চোয়াল অপারেশন করে বাদ দিতে হতে পারে। সিডিসি (CDC) অনুসারে, এই রোগে গড় প্রাণহানির হার ৫৪ শতাংশ। এই রোগে আক্রান্ত হলে কয়েক দিনের মধ্যেই মানুষ মারা যেতে পারে, তবে এটি সংক্রামক নয় সিডিসির মতে। ভারতে সাধারণত বছরে বেশ কিছু মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হন। তবে সাধারণত ডায়াবেটিস রোগীরা এবং ক্যানসার-আক্রান্তরা সমস্যায় পড়ছেন ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের সংক্রমণ হলে। ব্ল্যাক ফাঙ্গাসে মূলত তাঁরাই আক্রান্ত হচ্ছেন, যাঁদের দীর্ঘদিন রোগভোগের জেরে শরীরের অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গিয়েছে। শরীরের কোনও অঙ্গ ট্রান্সপ্লান্ট হয়েছে, ক্যানসার রয়েছে এই ধরণের ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও সংক্রমণের আশঙ্কা বেশি রয়েছে। দীর্ঘ দিন ভেন্টিলেটরে রয়েছেন যাঁরা তাঁদের ক্ষেত্রেও রয়েছে যথেষ্ট আশঙ্কা। এমনকি স্টেরয়েডের ভুল ব্যবহারের জেরে তৈরি হতে পারে সংক্রমণের আশঙ্কা।

সম্ভাবনার অপর নাম ইনট্রোভার্টিজম

লেখাঃ ফারহানা অনন্যা
Rangpur Govt. College, Rangpur

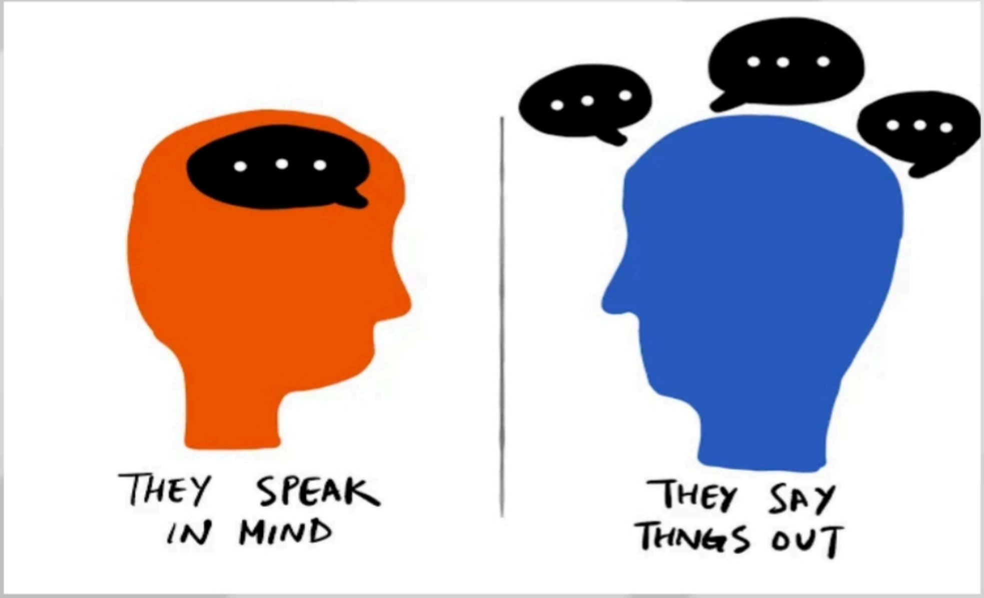


অন্তর্মুখী মানুষদের নিয়ে প্রচলিত কিছু ধারণা রয়েছে যার কারণে সিংহভাগ মানুষ মনে করে থাকে অন্তর্মুখী হওয়া একটি নেতিবাচক ব্যাপার। কিন্তু আদতে অন্তর্মুখী এবং বহির্মুখী মানুষের মস্তিষ্কের গঠন সম্পূর্ন আলাদা, এমনকি তাদের ডোপামিন (Dopamine) নিঃসরন প্রক্রিয়াও ভিন্নভাবে হয়ে থাকে।অর্থাৎ আপনি অন্তর্মুখী নাকি বহির্মুখী তা জন্ম থেকেই নির্ধারিত।

আমার ব্যাক্তিগত জীবনে আমি দেখেছি অন্তর্মুখী মানুষেরা খুবই দৃঢ় ব্যাক্তিত্বের হয়ে থাকে এবং কাছের মানুষদের প্রতি বহির্মুখী মানুষদের তুলনায় বেশি যত্নবান। অন্তর্মুখী মানুষদের নিয়ে প্রচলিত কিছু ধারনা বা ভুল ধারণা গুলো হলোঃ

১- অন্তর্মুখী মানুষেরা কথা বলতে পছন্দ করে না।

এটি সত্য নয় , অন্তর্মুখী মানুষেরা কথা বলেনা যতক্ষন পর্যন্ত না তাদের বলার কিছু আছে।

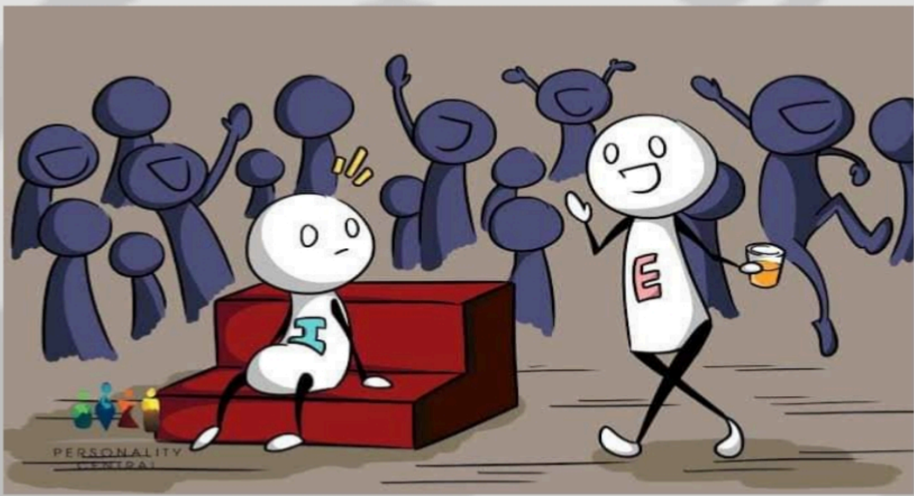


২- অন্তর্মুখীরা মানুষজন পছন্দ করে না।

মজার ব্যাপার হলো, অন্তর্মুখী মানুষেরা তাদের কাছের মানুষ অল্প হলেও , সেই সম্পর্কগুলোর গভীর কদর এবং শ্রদ্ধা করে থাকে। তাদের কাছের মানুষদের সংখ্যা তারা এক হাতে গুনে শেষ করতে পারবে। যদি আপনি যথেষ্ট সৌভাগ্যবান হয়ে থাকেন এবং একজন অন্তর্মুখী মানুষ আপনাকে বন্ধু ভাবে, তবে সম্ভাবনা হলো আপনার সারাজীবনের জন্য একটি অনুগত সহচর রয়েছে। একবার আপনি তাদের কাছে একজন মানুষ হিসেবে শ্রদ্ধার জায়গা আদায় করে নিতে পারলেই আপনি আপনার সবকিছুতে তাকে পাশে পাচ্ছেন।

৩- অন্তর্মুখীরা জনবহুল জায়গায় যেতে চায়না।

অর্থহীন কথা। তারা জনবহুল জায়গায় যেতে চায়না এমনটা একেবারেই সঠিক নয়, বলা যেতে পারে তারা দীর্ঘক্ষন থাকতে চায়না। তারা পাব্লিক এক্টিভিটি তে জড়িত জটিল বিষয়গুলোও এড়িয়ে যেতে চায়। তারা তথ্য খুবই দ্রুত ধারন করতে পারে এবং তা থেকে অভিজ্ঞতার সঞ্চার করতে পারে, যার ফলে তাদের কোন কিছু বুঝতে দীর্ঘসময়ের প্রয়োজন হয় না। সমস্ত তথ্য বিশ্লেষন করার জন্য নিজেকে রিচার্জ করে নিতে তৈরি থাকে। রিচার্জ করার ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ন অন্তর্মুখী মানুষদের জন্য।



৪- অন্তর্মুখীরা সবসময় একা থাকতে চায়।

অন্তর্মুখীরা নিজেদের চিন্তা ভাবনা নিয়ে সম্পূর্ন স্বাচ্ছন্দে থাকতে পারে। তারা প্রচুর চিন্তা করে, তারা স্বপ্ন দেখে। তাদের সমস্যার সমাধান নিয়ে কাজ করতে ভালো লাগে এবং ধাধার উত্তর মেলানোতে তাদের আনন্দ।



৫- অন্তর্মুখীরা অদ্ভুত।

অন্তর্মুখীরা প্রায়ই ব্যাক্তিত্ববাদী হয়ে থাকে। তারা গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসায় না। এর চেয়ে তারা নিজেদের আদর্শ নিয়ে থাকার জন্য মূল্যায়িত হওয়া পছন্দ করে। যুক্তি এবং বিশ্লেষন ক্ষমতা তাদের তুলনামূলক বেশি হওয়াতে তারা বেশিরভাগ সময়ই প্রচলিত আদর্শ গুলোকে চ্যালেঞ্জ করে থাকে এবং মেনে নিতে পারেনা। তাদের মস্তিস্কের ডোপামিন নিউরোট্রান্সমিটার খুবই স্পর্শকাতর।



এবারে আসি আসল কথায়। সম্ভাবনার অপর নাম ইন্ট্রোভার্ট।কি অবাক হচ্ছেন! চলুন দেখে নেয়া যাক--

একটি জরিপে দেখা গেছে,ইন্ট্রোভার্ট ব্যক্তিরা গল্প,আড্ড,জনসমাগম এড়িয়ে নানা সৃষ্টিশীল কাজে ব্যস্ত থাকে।বেশিরভাগ যুগান্তকারী আইডিয়াগুলো এসেছে ইন্ট্রোভার্টদের মস্তিষ্ক থেকে।পৃথিবীর প্রায় ৬০% খ্যাতিনামা ব্যক্তিই আপাতপক্ষে ছিলেন ইন্ট্রোভার্ট। হ্যারিপটারের লেখক **জে.কে রাওলিং** থেকে শুরু করে **বিল গেটস**,এমনকি **মহাত্মাগান্ধী** পর্যন্ত ছিলেন এমন। ইন্ট্রোভার্ট মানেই লাজুক,অসামাজিক কিংবা কথা কম বলা নয়।

Let's judge thyself. Are you
1. Introvert
Or
2.Extrovert ??

ড্রাগনফ্লাই

লেখাঃ মোহাম্মদ ফেরদৌস আলম
Collectorate School & College Rangpur

আমরা যারা গ্রামে বা কিছুটা মফস্বল থেকে বেড়ে উঠেছি, তাদের মধ্যে বেশিরভাগ কচি-কাচা একটা খেলার সাথে বেশ পরিচিত। অন্য সবার চেয়ে আমার এই খেলাটায় বেশি আগ্রহের ছিলো। আমার ছেলে বেলায় এমন একটা দিনও যায়নি যেদিন আমি ফড়িং ধরিনি। ফড়িং ধরে সুতো দিয়ে লেজে গিট(বাঁধন)দিতাম। কোনোদিন সুতো না পেলে কাঁথা থেকে সুতো বের করতাম,এর জন্য যে কত দিন ঝাড়ুর পেটা খাইছি যে হিসাব করাটা" এক বাটি সুপারি গনতে না পায় ব্যাপারির" মত হয়ে যাবে।কি নস্টালজিক!!!! নিজেকে আসল না হলেও মিনি ডেনেরিস ফিল করতাম,যদিও তখন "GOT", তথাকথিত ১০০০ তলোয়ার ওয়ালা আয়রন থ্রোনস, ড্রাগন-ডেনেরিস কিছুই জানতাম না কিন্তু যখন লেজে সুতো বেধে ফড়িং গুলোকে ঘুরির মতো উড়াতাম বর্তমানের পারস্পেক্টিভে ডেনেরিস-ডেনেরিস একটা ভাইব আসতো। কি ছিলো সেই দিন গুলো!!!



যাইহোক, আমরা অনেকে হয়তো জানি আর হয়তো জানি না, যে এই(চিত্র) আর্থোপোডা ভুক্ত প্রানীটিকে ইংরেজিতে ড্রাগন ফ্লাই বলে।

এবার আসুন,সবাই ড্রাগন ফ্লাই নিয়ে কিছু মজার তথ্য জেনে নেইঃ

১)প্রানীজগতে খুব কম প্রজাতি আছে, যারা ড্রাগনফ্লাই এর মত অসাধারন উড্ডয়ন সক্ষমতা রাখে।

২) এরা প্রতি সেকেন্ডে ৩০ বার ডানা স্পন্দন করতে পারে, যেখানে মৌমাছি প্রতি সেকেন্ডে ৩০০ বার স্পন্দন করে।

৩) ড্রাগনফ্লাইয়ের ৪টি/২ জোড়া ডানা থাকে, প্রতিটি ডানা আলাদা আলাদা ভাবে উড়তে সাহায্য করে।

৪) এদের সম্পূর্ণ মস্তক জুড়ে দর্শন ইন্দ্রিয়ের অবস্থান এবং তাদের অত্যন্ত ধারালো ম্যান্ডিবল দেখা যায়।

৫) তাদের ৬ টি পা থাকলেও হাটার জন্য তা খুব একটা উপযোগী নয়।

৬) এদেরকে সাধারণত মানুষকে দংশন করতে দেখা যায় না।

৭) এরা ছোটখাটো পোকামাকড় খেয়ে জীবন ধারন করে।

৮) এরা শিকারের সময় তাদের পা গুলোকে একত্রে বক্স আকৃতির করে।

৯) এরা সাধারণত স্যাতস্যাতে পরিবেশ যেমনঃ পুকুরের ধারে,ডোবা,লেক ইত্যাদিতে অভ্যস্ত এবং পানিতে ডিম পাড়ে।

১০) কিছু প্রজাতিকে নোনা পানিতেও ডিম পাড়তে দেখা যায়।

১১) প্রতিকুল পরিবেশে প্রায় ২ বছর পানির নিচে থাকতে পারে।

সবচেয়ে মজার বিষয় হলো...কোনো কোনো সংস্কৃতিতে-ড্রাগন ফ্লাই কোনো ব্যাক্তির মাথায় এসে বসলে সেই ব্যাক্তিকে সৌভাগ্যবান হিসেবে গন্য করা হয়।অর্থাৎ সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে ধরা হয়।

প্রজনন শেষে পুরুষ এবং ডিম পাড়ার পর স্ত্রী ঘাস ফড়িং উভয়েই মারা যায়..।

ক্লেইন লেভিন সিন্ড্রোম

লেখাঃ জারিন তাসনিম
Saidpur Govt. Technical College, Nilphamari



Electroencephalogram (EEG) Can Study Abnormal Sleep Patterns And Help Diagnose Kleine-Levin Syndrome

"হঠাৎ হঠাৎ এমন হয় যে, আমি দুই-এক মিনিট আগেই ঘুম থেকে উঠে যাই। দুইটা আটান্ন কিংবা উনষাট। এমনকি একবার দুটো সাতান্নতেও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। কেমন যেন অজানা একটা ভালো লাগায় মন ভরে ওঠে তখন। মনে হয় প্রতিটা মিনিট আমার জন্য এক একটা উপহার।"

-হেনরী বিনস

দেখে হয়তো মনে হচ্ছে আমি এখন সময়ের মূল্য নিয়ে লম্বা একটা লেকচার দিবো।

না, তা নয়! বরং একটু গল্প শোনাই। নিক পিরোগের 3:00 AM সিরিজের সাথে আমরা অনেকেই পরিচিত। বেশ চমৎকার বইগুলো! এখানে পাওয়া যায় হেনরী বিনসকে, যে নিজেই হেনরী বিনস নামে অদ্ভুত এক রোগে আক্রান্ত! আর এই রোগ তেমন আহামরি কিছু নয়। দিনরাত শুধু ঘুমাতে হয়!! এক্স্যাক্টলি! মেডিকেল সাইন্সে একে বলা হয় ক্লেইন-লেভিন সিন্ড্রোম। এর প্রধান উপসর্গ হলো অতিরিক্ত ঘুম। আক্রান্ত ব্যক্তি ১২-২৪ ঘন্টা পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকে।

ঘুম অবশ্য আমারও ভীষণ প্রিয় একটা জিনিস। তাই বলে সারাদিন ঘুমিয়ে থাকতে রাজি নই।
যাইহোক, সারাদিন ঘুমিয়ে থাকার কারণে তারা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে এটাই স্বাভাবিক। এছাড়াও অনেকের ক্ষেত্রে হ্যালুসিনেশন হতেও দেখা গেছে। এখন পর্যন্ত এমনটা হওয়ার কারণ অবশ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে গুটিকয়েক নিউরো সাইন্টিস্ট মনে করেন হাইপোথ্যালামাস এর সমস্যার জন্যে এমনটা হতে পারে। আরও মজার ব্যাপার হচ্ছে এর কোন চিকিৎসা নেই। তবে সমাধান আছে! আর তা হলো সে ব্যক্তিকে নিজের মতো ঘুমাতে দেওয়া।

তাই আসুন, নিজে শান্তিতে ঘুমাই আর অন্যদেরও শান্তিতে ঘুমাতে দিই!



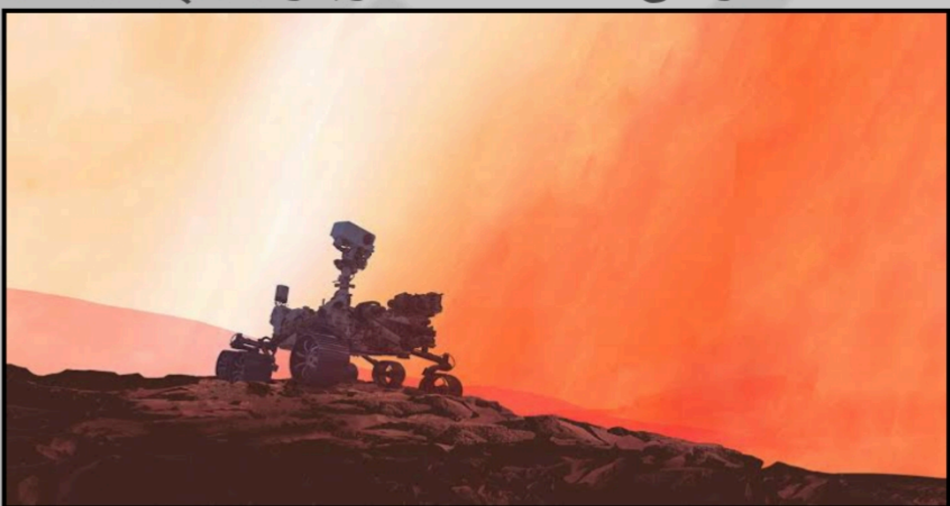
পারসিভারেন্সঃ মঙ্গলের উদ্ভিদ

লেখাঃ মাহমুদ হাসান মাসুক
BN College, Dhaka

মঙ্গলগ্রহকে আমাদের দ্বিতীয় বাসস্থান বানাতে যেন হুমড়ি খেয়ে পরেছে সব মহাকাশ গবেষণা সংস্থাগুলো। বিগত কয়েক বছরে এলন মাস্কের স্পেস এক্স যেভাবে তাদের অভিযান চালিয়ে গেছে এবং সায়েন্স ফিকশনকে সত্যি করতে প্রত্যাশা দেখিয়েছে অন্যদিকে নাসাকে এতটা সরব দেখা যায় নি। তাই বলে নাসা কিন্তু কম যায় নি।

স্পেস এক্স যখন মঙ্গলে কলোনি গঠন করার নীল নকশা সবার সামনে পেশ করে তাক লাগিয়ে দেয়, তখন নাসা ২০২০ সালের ৩০শে জুলাই তাদের পঞ্চম রোভার পারসিভারেন্স-ডাক নাম পার্সি কে ফ্লোরিডার **Cape Canaveral Air Force Station** থেকে **Atlas V-541** রকেটের মাধ্যমে উৎক্ষেপণ করে মঙ্গলের উদ্দেশ্যে পাঠায়।

কিন্তু এ তো আর নতুন কিছু নয়। এর আগেও ১৯৯৭ সালে তাদের প্রথম রোভার **Sojourner** কে মঙ্গলে পাঠায়। এরপর **Spirit, Opportunity, Curiosity.**
তাহলে নাসার এই রোভারকে নিয়ে কেনো আমরা এতো উৎসুক হবো। সত্যি বলতে, নাসার এই প্রোজেক্টের বিবরণ শুনলে অবাক হবে যে কেউ।

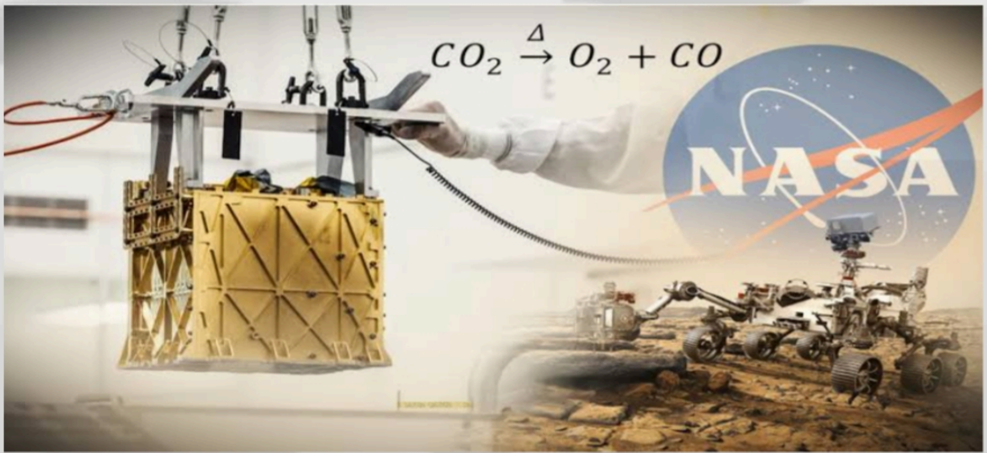


পারসিভারেন্সের মঙ্গল অভিযানের প্রধান কাজ হচ্ছে, প্রাচীন জীবনের চিহ্ন সন্ধান এবং পাথর সংগ্রহ করা।
২০২১ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি মঙ্গলে অবতরণের পর ৬০তম মঙ্গল দিবসে **(60th Sol/Martian Day)** অথবা পৃথিবীর দিন হিসেবে ২০ এপ্রিল,২০২১ মঙ্গলের আবহমণ্ডলে পার্সি প্রথম অক্সিজেন এর নিঃশ্বাস ছাড়ে।
মঙ্গলগ্রহের আবহমণ্ডলের ৯৬% ই কার্বন ডাইঅক্সাইড। অর্থাৎ লাল মাটির এই গ্রহ প্রাণিকূলের বসবাসের অযোগ্য। আর মঙ্গলগ্রহকে দ্বিতীয় বাসস্থান বানাতে হলে এর আবহমণ্ডলে অক্সিজেন এর যোগান দিতে হবে।

এই বিষয়টিকে মাথায় রেখেই নাসার বিজ্ঞানীরা পার্সির সঙ্গে **MOXIE(Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment)** নামের একটি কনভার্টার যন্ত্রকে যুক্ত করেছিলেন। পার্সির কারিগরদের তথ্যমতে, **MOXIE** একটি পরীক্ষামূলক যন্ত্র। তারা দেখতে চেয়েছিলেন যে মহাকাশে ৭ মাস যাত্রা করে মঙ্গলে অবতরণের পর যন্ত্রটি কাজ করে কিনা।
যাই হোক, **MOXIE** তার কারিগরদের নিরাশ করেনি। ২০ এপ্রিল **(60th Sol)** এ **MOXIE** ১ঘন্টা কার্য চালিয়ে ৫.৪গ্রাম অক্সিজেন উৎপন্ন করতে সক্ষম হয়। এই পরিমাণ অক্সিজেন একজন নভোচারীকে ১০ মিনিট বাঁচিয়ে রাখতে পারবে। মঙ্গলের বুকে এ যেনো এক কৃত্রিম উদ্ভিদ।



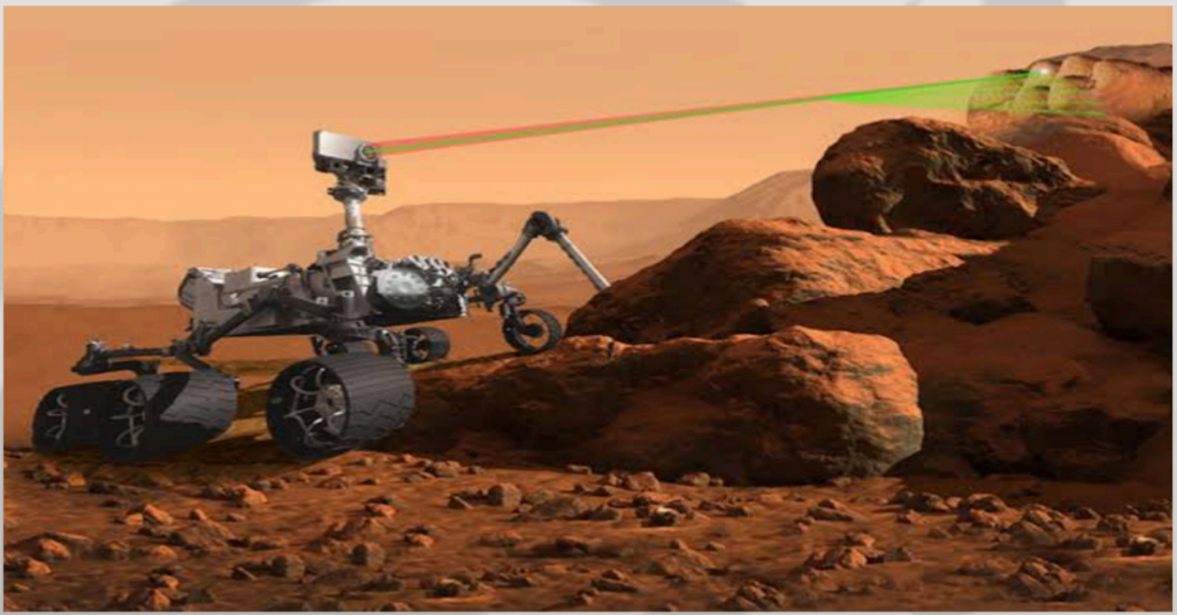
MOXIE ইউনিটি তাপ সহনশীল উপকরণ দিয়ে তৈরি। এর মধ্যে থ্রিডি প্রিন্টেড নিকেল অ্যালোয় অংশ রয়েছে, যা এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত গ্যাসগুলিকে গরম করে এবং শীতল করে। তাছাড়াও আছে হালকা অ্যারোজেল যা তাপকে ধরে রাখতে সহায়তা করে। **MOXIE** এর বাইরে আছে পাতলা সোনার আবরণ যা ইনফ্রারেড তাপকে প্রতিফলিত করে যাতে পারসিভারেন্স এর অন্যান্য যন্ত্রাংশ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। **MOXIE** কে এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে প্রতি ঘন্টায় ১০গ্রাম করে অক্সিজেন উৎপন্ন করতে পারে।



MOXIE এর ভবিষ্যৎ-

MOXIE মঙ্গলের এই ১ বছরে (পৃথিবীর ২ বছরে) আরও ৯ বার অক্সিজেন উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাবে। পার্সির পরিচালকরা বলেন **MOXIE** কে মঙ্গলের বিভিন্ন আবহাওয়ায় চালানো হবে। অধিক উষ্ণতার এবং শীতের সময়, এমনকি মঙ্গলীয় ধূলিঝরের সময়ও এটিকে চালিয়ে দেখা হবে। কেননা ভবিষ্যতে, নাসা বর্তমান **MOXIE** এর থেকে ২০০গুন অধিক কার্যকর **MOXIE** কে মঙ্গলে পাঠাতে বদ্ধপরিকর। এ বিষয়ে এক বিবৃতিতে MOXIE এর প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটর Michael Hecht বলেন, ভবিষ্যতের কোনো মিশনে মঙ্গলের মাটি থেকে ৪জন নভোচারী সহ একটি রকেটকে উৎক্ষেপণ করতে ৭ মেট্রিকটন রকেট জ্বালানি এবং ২৫ মেট্রিকটন অক্সিজেন এর প্রয়োজন হবে। আর নভোচারীরা ১ বছরে হয়তোবা ওই ২৫ মেট্রিকটন থেকে ১ মেট্রিকটন অক্সিজেন দিয়ে বেঁচে থাকবে।



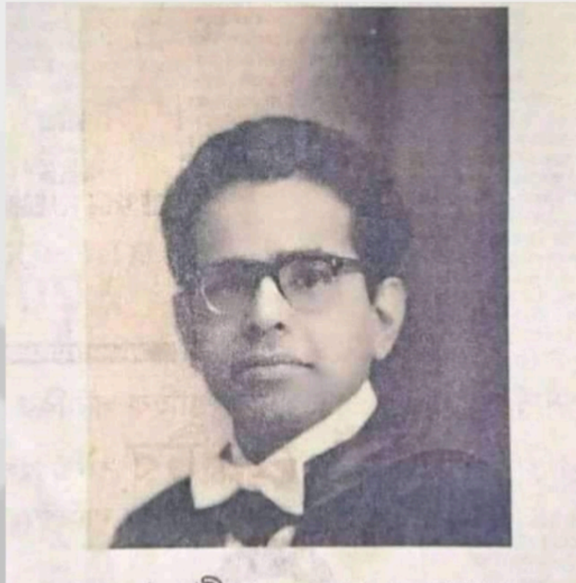


এই ২৫ মেট্রিকটন অক্সিজেন পৃথিবী থেকে মঙ্গলে নিয়ে যাওয়ার থেকে ১ টন ওজনের অক্সিজেন কনভার্টার (**MOXIE** এর সুপ্রিম ভার্সন) নিয়ে যাওয়া অনেক সাশ্রয়ী এবং সব দিক থেকে লাভজনক। বিজ্ঞানীরা আশাবাদী **MOXIE** এর সুপ্রিম ভার্সন মঙ্গলের আবহমণ্ডলে ২৬ মাস পর্যন্ত অক্সিজেন উৎপন্ন করতে পারবে। যা মঙ্গলকে আমাদের দ্বিতীয় বাসস্থান বানানোর প্রচেষ্টাকে আরও একধাপ এগিয়ে নেবে। আমরাও সেই দিনের প্রত্যাশি যেদিন মানবসভ্যতা লাল গ্রহে কলোনি গড়ে তুলবে।

টেস্টটিউব বেবি ও এক অবহেলিত বিজ্ঞানী

লেখাঃ প্লাবন স্নেহময়
Jangipur College, Raghunathganj, India





১৬ জানুয়ারী ১৯৩১ - ১৯ জুন ১৯৮১

""একজন বাঙালি পাগল কিনা টেস্ট টিউব বেবি বানাবে !!! পাগলেও বিশ্বাস করবে ???""

----------- খানিকটা এরকমই মত পোষন করেছিল তৎকালীন রাজ্যসরকার !

শুধু ভারতবর্ষে নয়, বিশ্ববিজ্ঞান গবেষণার প্রেক্ষিতে ড. সুভাষ মুখোপাধ্যায় আদতে এক অবিস্মরণীয় নাম।
২০১০ সালে প্রকাশিত ডিকশনারি অফ মেডিকেল বায়োগ্রাফিতে পৃথিবীর ১১০০টি যুগান্তকারী আবিষ্কারের তালিকায় কলকাতা থেকে যে তিনজনের নাম ছিল তাঁরা হলেন রোনাল্ড রস, উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী এবং ড. সুভাষ মুখোপাধ্যায়। ১৯৭৮ সালে বিজ্ঞানী প্যাট্রিক স্টেপটো ও বিজ্ঞানী রবার্ট এডওয়ার্ডসের গবেষণার ফল হিসেবে পৃথিবীর প্রথম টেস্টটিউব বেবি লুইস ব্রাউনের জন্মের ৬৭ দিন পর বিশ্বের দ্বিতীয় ও ভারতের প্রথম টেস্টটিউব বেবির জন্ম হয় ড. সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের হাত ধরে।

পাঁচটি ভ্রূণকে তরল নাইট্রোজেনে ৫৩ দিন হিমায়িত রাখার পর ১৯৭৮-এর ১৮, ১৯ ও ২0 জানুয়ারি পরপর তিনদিন তিনটি ভ্রূণ জনৈক ভদ্রমহিলা বেলা আগরওয়ালের গর্ভে সংস্থাপন করেন গাইনোকলজিস্ট সরোজ ভট্টাচার্যের সাহায্যে। তারই ফলস্বরূপ বিয়ের ১৬ বছর পর আগরওয়াল দম্পতি এক মেয়ে শিশু সন্তানের জন্ম দেন ১৯৭৮-এর ৩ অক্টোবর।

কিন্তু একপ্রকার সরকারি অবহেলায় তার এই কৃতিত্ব নাকচ হয়ে যায়| এবং এই কৃতিত্ব পান তারও পাঁচ বছর পর টেস্ট টিউব বেবি জন্ম দেয়া টি.সি আনন্দকুমার|

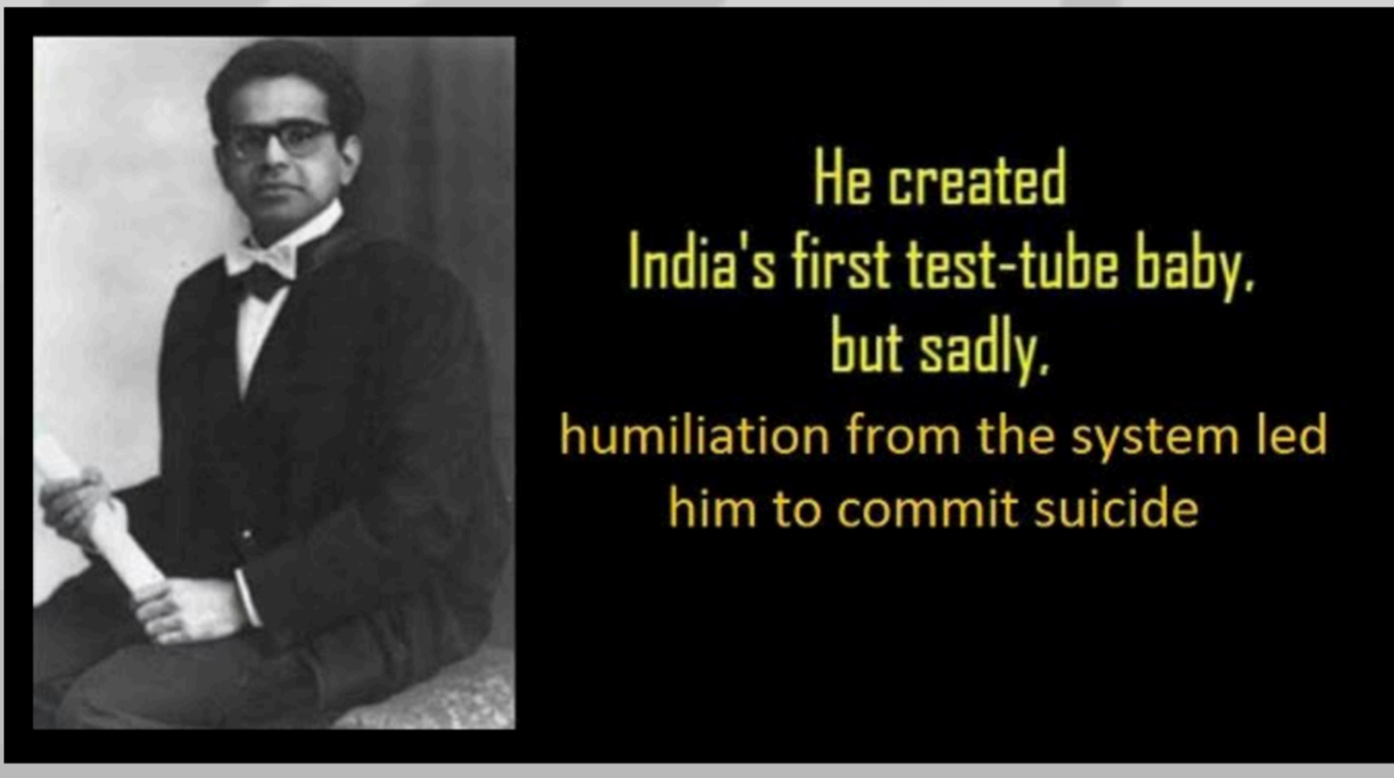
টি.সি আনন্দকুমার নিঃসন্দেহে একজন স্বচ্ছ গবেষক ছিলেন| সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গবেষণা করা ডকুমেন্টস তার হাতে এসে পৌঁছলে স্বীকৃতির মুকুট নির্দ্বিধায় ড. মুখোপাধ্যায়ের মাথায় তুলে দেন আনন্দ কুমার। ২00২ সালে 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ' সুভাষবাবুর কাজকে স্বীকৃতি দেয়।



অথচ কত গভীর বেদনা নিয়ে এই মানুষটিকে সুইসাইড করতে হয়েছিল !!!!! নিজেকে মেলে ধরতে না পারার বেদনা , সারাজীবনের পরিশ্রম কিছু মূর্খ মানুষের কারণে পণ্ড হয়ে যেতে দেখার বেদনা !

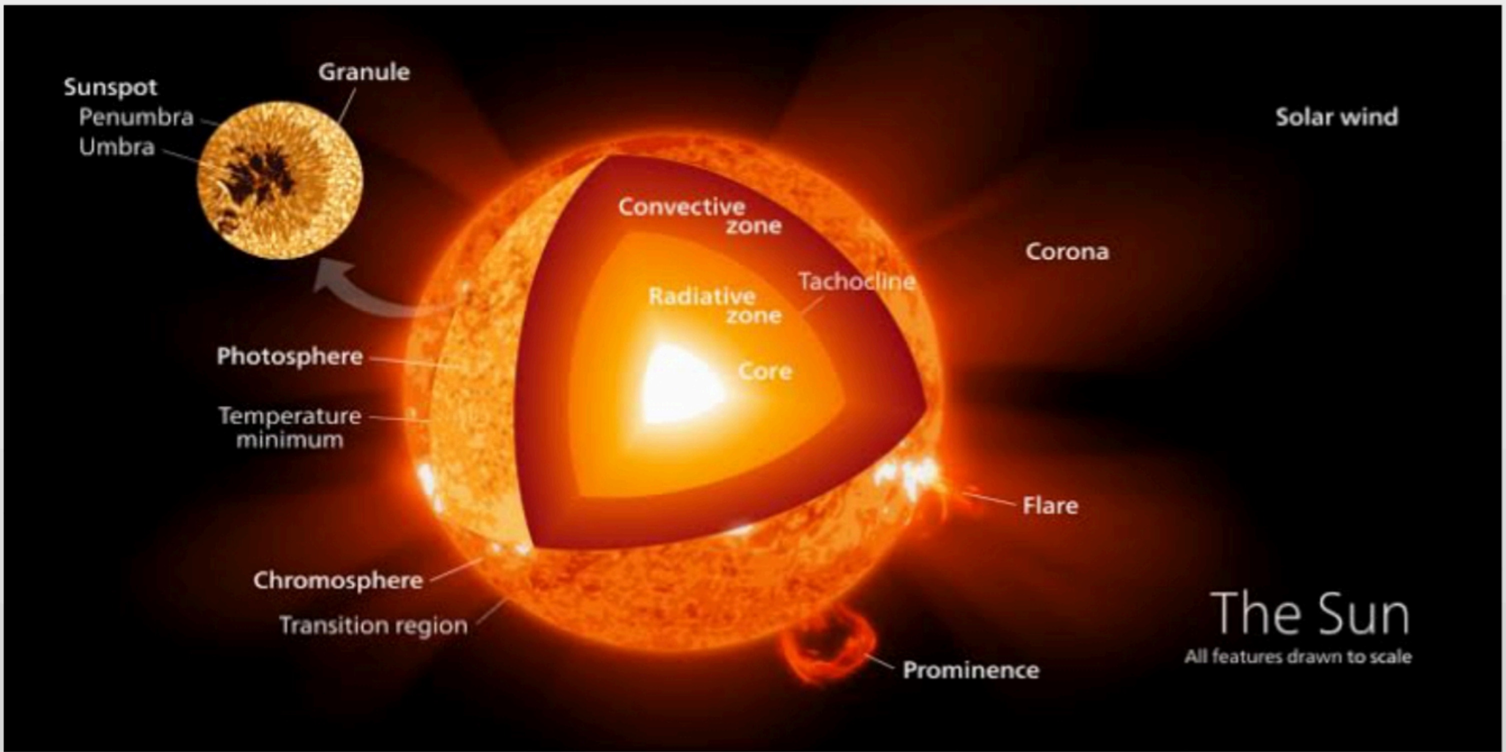
২০১০ সালেই প্রথম টেস্ট টিউব বেবি পদ্ধতির আবিষ্কারক হিসাবে চিকিৎসাশাস্ত্রে অবদানের জন্য নোবেল পুরস্কার পান রবার্ট এডওয়ার্ডস ।

কে বলতে পারে , প্রশাসন একটু সজাগ থাকলে হয়ত এই নামটির সাথে আরও একটি বাঙালি নাম জুড়ে যেত !



সূর্যের নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া

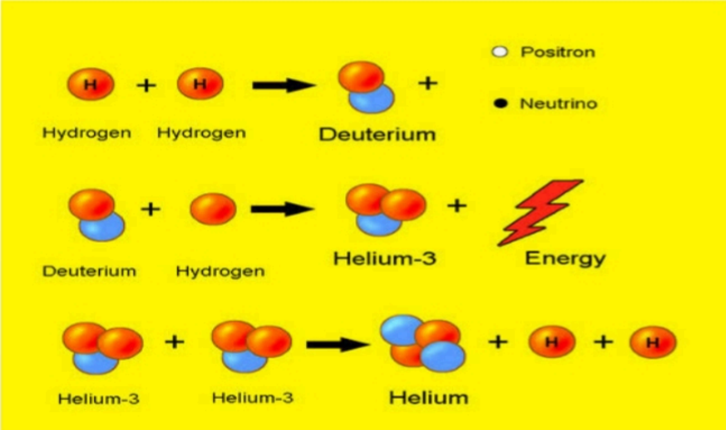
লেখাঃ আলিফা বিনতে জামান
Collectorate School & College, Rangpur



ছোটবেলা থেকেই আমি ভাবতাম সূর্য একটা বিশাল আগুনের গোলা,যা আমাদের মহাকাশে জ্বলছে।কিন্তু সত্যি কী সূর্য আগুনের গোলা? মহাকাশে তো অক্সিজেন নেই তাহলে এটা জ্বলছে কী করে? আর আমাদের এই সূর্য এলোই বা কই থেকে?

তবে আমার এই প্রশ্ন গুলোর সমাধান একদিন খুঁজে পাই,বিভিন্ন বই পড়ে, ইণ্টারনেটে খুঁজে,
আমাদের সূর্য বিগত ৪.৬ বিলিয়ন বা ৪৬০ কোটি বছর ধরে একই রকম রয়ে গেছে। সেই সময় থেকে যখন না তো আমাদের পৃথিবীর কোনো অস্তিত্ব ছিল, আর না তো মঙ্গলের, না তো বৃহঃস্পতির,শনি,ইউরেনাস, নেপচুন।আমাদের সূর্য আকাশে দেখতে পাওয়া অন্য অন্য নক্ষত্রের মতোই একটা সাধারণ নক্ষত্র। সূর্য একটা **G type main sequence star** । এ জাতীয় নক্ষত্র মহাকাশে অনেক কম।

সূর্যে ঘটা বিক্রিয়া



এটা বিস্ময়কর যে,সূর্য আমাদের মহাকাশেই জ্বলে না। সূর্যের শক্তি নির্গত হয় সূর্যের মধ্যে হওয়া **Stellar Nucleosynthesis** প্রক্রিয়ার জন্য। এই প্রক্রিয়ায় পরমানুর **Nuclear Fusion** হয়। আমরা জানি যে, বেশির ভাগ নক্ষত্র বা তারা হাইড্রোজেন গ্যাস দ্বারা গঠিত। নক্ষত্রের কেন্দ্রে বা মধ্যে **Nuclear Fusion** বিক্রিয়া চলাকালীন হাইড্রোজেন পরমানু গুলো হিলিয়ামে রূপান্তরিত হয়। আর এই বিক্রিয়ার ফলে প্রচুর পরিমানে শক্তি উৎপাদন হয়। একে আবার **Hydrogen Burning** ও বলে। সূর্য হাইড্রোজেন এর উপর অতিরিক্ত চাপ প্রয়োগ করায় এরা নিজেদের মধ্যে বিক্রিয়া করে হিলিয়াম এ রূপান্তরিত হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন শক্তি রশ্মির মাধ্যমে পৃথিবীতে চলে আসে। যেহেতু এই প্রক্রিয়ায় কোনোকিছু পুড়ছে না সেহেতু এই প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন এর ও প্রয়োজন হচ্ছে না।

আমাদের সূর্য আসলে হচ্ছে গরম হাইড্রোজেন প্লাজমার একটা বিশাল গোলা, যার মধ্যে অনবরত **Nuclear Fusion** বিক্রিয়া চলছে। হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, কার্বন, নিয়ন, অক্সিজেন ইত্যাদিতে প্রতিবর্তন হয়ে চলেছে। যার ফলে সূর্য ক্রমশ ভারী হয়ে যাচ্ছে।

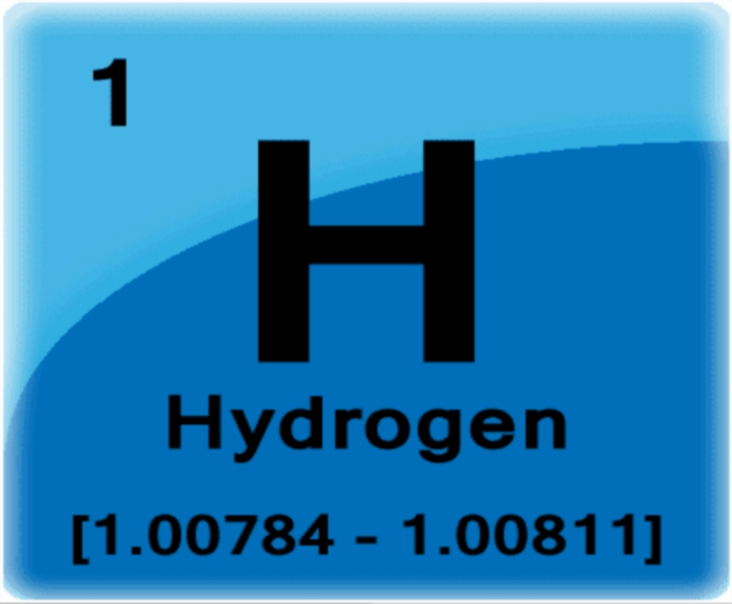
আমাদের সূর্য ৯১% হাইড্রোজেন, ৮.৯% হিলিয়াম এবং ০.১% অন্যান্য উপাদান দিয়ে তৈরী। এই **percentage** সময়ের সাথে সাথে বদলাতে থাকে।

সলিড ধাতুরূপে হাইড্রোজেন

লেখাঃ মাহফুজ আহমেদ চৌধুরী
Police Lines School & College, Rangpur

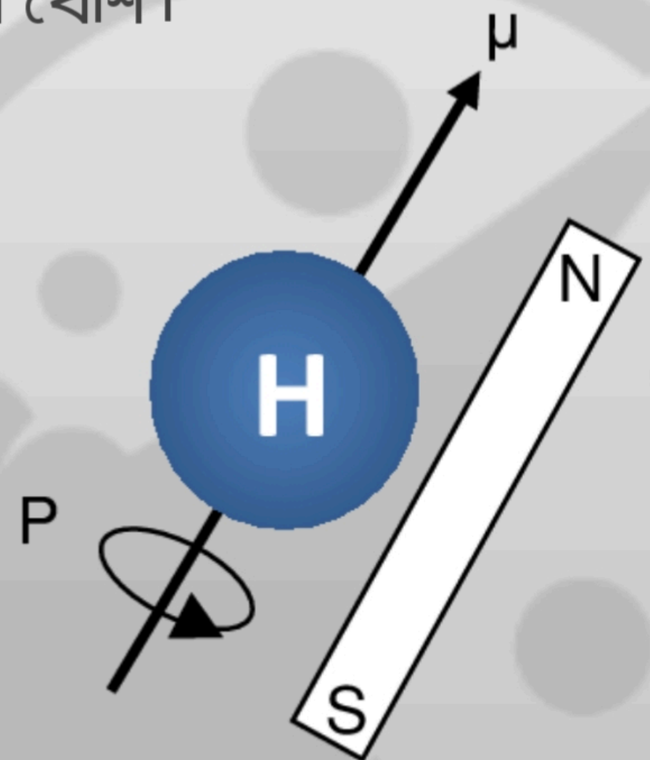
হেনরি ক্যাভেনডিশের হাইড্রোজেন গ্যাস কে নতুন করে জানা

হাইড্রোজেন এর সলিড ধাতু!! এটা আদৌও সম্ভব??



হুম অবশ্যই সম্ভব। ১৯৩৫ এর সময়কাল থেকেই গবেষকদের মধ্যে হাইড্রোজেনকে ধাতুতে পরিনত করার প্রয়াস দেখা দেয়। তবে তা কিন্তু সহজ কোনো বিষয় ছিলো না। পর্যায় সারণীর প্রথম মৌল হাইড্রোজেন কে আমরা অধাতু হিসেবে জেনে থাকার পরেও এটিকে অবস্থান দেওয়া হয়েছে ধাতু শ্রেনীতে যদিও হাইড্রোজেন এর ইলেকট্রন ত্যাগ করার কোনো ধর্ম পরিলক্ষিত হয়না। তবে আশির দশকে অনেক গবেষক এর মতামত অনুযায়ী অতি উচ্চচাপ ও তাপ প্রদানের মাধ্যমে হাইড্রোজেন কে ধাতুতে রূপান্তর করা সম্ভব।

১৯৩৫ সালে হাইড্রোজেন কে ধাতুতে পরিনত করার জন্য চাপ ২৫ গিগা প্যাসকেল ধরে নেওয়া হয়েছিলো। কিন্তু এতো চাপেও এই রূপান্তর অসম্ভব ছিলো। পরবর্তীতে ২০১৬-এর অক্টোবরে আইজাক এফ. সিলভেরার নেতৃত্বে এক দল পদার্থবিদ হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে হাইড্রোজেনকে ধাতব রূপ দিতে সক্ষম হন। এরজন্যে ৫.৫ কেলভিন অর্থাৎ -২৬৭.৬৫ সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার এবং ২৫ গিগা প্যাসকেল এর ২০গুন বেশি চাপ প্রয়োগ করতে হয়। যা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলীয় চাপের ৫০ লক্ষ গুণ বেশি।



কিন্তু এতো এতো ধাতব পদার্থ থাকা সত্ত্বেও গবেষকরা কেনো হাইড্রোজেনকেই ধাতু রূপে ব্যাবহার করতে চান??

এই বিষয়ে তারা বলেন হাইড্রোজেন ধাতু রূপে জিরো রেসিসটেন্স পরিবাহী হিসেবে কাজ করে। এতে করে রোধ একেবারেই শূন্যের কোঠায় চলে আসে। এর ব্যাবহারে আমাদের বৈদ্যুতিক পরিবাহী ব্যাবস্থাপনায় আসতে পারে ব্যাপক পরিবর্তন ।

PEGASUS SPYWARE

লেখাঃ মাহমুদ হাসান মাসুক
BN College, Dhaka

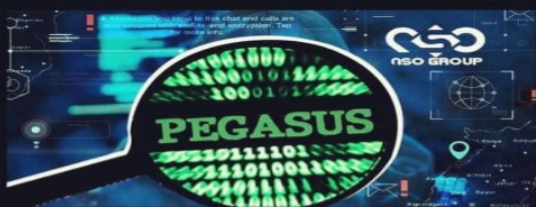
NSO(Niv, Shalev and Omri, কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা তিনজনের নাম) গ্রুপের **Pegasus** স্পাইওয়্যার বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই সরকারিভাবে লাইসেন্স প্রাপ্ত। যেগুলি যেকোনো **Operating System** দ্বারা চালিত **Phone** কে কোনো ক্লিক ছাড়াই সংক্রমিত করতে পারে।

২০10 সালে মেক্সিকো এনএসওর প্রথম বিদেশী ক্লায়েন্ট ছিল। মাত্র এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে উত্তর তেল আভিভের ইজরায়েলের সিলিকন ভ্যালিতে তাদের কার্যালয় গড়ে তোলে।

এটি একটি ইজরায়েল ভিত্তিক সংস্থা যা সরকারী এজেন্সিগুলিতে **Spyware Software** লাইসেন্স করে। সংস্থাটি বলেছে যে, "এর **Pegasus Software** একটি মূল্যবান পরিষেবা সরবরাহ করে অপরাধী এবং সন্ত্রাসীদের উপর নজরদারি চলিয়ে। সফ্টওয়্যারগুলি গোপনে স্মার্টফোনগুলিতে চালিত হয় এবং ব্যবহারকরীরা কী করছে তার উপর আলোকপাত করে।" অন্যান্য সংস্থাও অনুরূপ সফটওয়্যার সরবরাহ করে বলে জানিয়েছে তারা।

OBLIVION

Cyber Security



Pegasus Spyware, NSO group দ্বারা Develop করা Spyware Tools এর Brand নাম। এটি একটি ইসরায়েলি সংগঠন যারা বিশ্বজুড়ে গোয়েন্দা সংস্থা, আইন প্রয়োগকারী এবং সামরিক বাহিনীর কাছে তাদের পণ্য এবং সার্ভিস সমূহ বিক্রি করে।

Amazon Company তাদের **Cloud Storage** থেকে **NSO** গ্রুপের **Cloud Computing** অ্যাকাউন্ট গুলো **Deactivate** করে দিয়েছে। ওই অ্যাকাউন্ট গুলো দিয়ে **Amazon** এর যে **Web Service** ব্যবহার করা হয়েছিল সেগুলোকে **Hacking** এর সরঞ্জাম হিসেবে কাজে লাগিয়ে **Spyware System** এর অংশ হিসেবে ফোনগুলির জরিপ চালানো হয়।

একটি ফরাসি অলাভজনক সংস্থা এবং মানবাধিকার গোষ্ঠী **Amnesty International** ৫০,০০০ এরও বেশি সংখ্যার একটি তালিকা প্রকাশ করেছে।

তালিকার উদ্দেশ্য অজানা তবে **NSO** দাবি করেছে যে এটি তাদের নজরদারি লক্ষ্যমাত্রার একটি তালিকা ছিল।



তদন্তে কাজ করা সংবাদমাধ্যমগুলি জানিয়েছে যে তারা এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ৫০ টিরও বেশি দেশ জুড়ে এক হাজারেরও বেশি লোককে সনাক্ত করেছে যারা এটির দ্বারা সংক্রমিত হয়েছে। এদের মধ্যে সাংবাদিক ও গনমাধ্যমে কাজ করা ব্যক্তি এবং অনেক দেশের প্রধান ও শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরাও আছেন।

Pegasus ফোনের Message, Photo, Email, Call Record এর Access নিতে পারে এবং গোপনে Microphone এবং Camera সক্রিয় করে নজরদারি চালাতে পারে।



Pegasus এমন একটি **Spyware** যা আপনার অফিসে, আপনার বাড়িতে, আপনার বিছানাতে, আপনার অস্তিত্বের প্রতিটি কোণে নজরদারি করতে সক্ষম। ফোনের ক্যামেরা অফ রেখেও নজরদারি করা থেকে শুরু করে ফোনে আপনার প্রতিটি ক্লিক **Spyware** পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম। এটি একটি সরঞ্জাম যা সভ্যতার প্রয়োজনীয় কোডগুলি ধ্বংস করে দিতে পারবে।

Thank You